জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৩০

Dawah or Destruction

আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস

ডা. জাকির নায়েক

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

আল্লাহর প্রতি আহ্বান
তা না হলে ধ্বংস

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

আছাদুল হক
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মনিরুজ্জামান খান
অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আল্লাহর প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১০

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

মূল্য : ৪৫.০০ টাকা মাত্র।

Invite to Allah or destroy : Dr. Zakir Naik Translated By Asadul Haq and Moniruzzaman, Published By Md. Rafiqul Islam, Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 45.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ্ব পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়। আলহামদুলিল্লাহ

কলকাতা বইমেলা– ২০০৮-এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে বিশ্বখ্যাত ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ।

বাংলা ভাষায় ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। আমাদের পিস পাবলিকেশন হতেও বিষয়ভিত্তিক ৩০ খানা বই বাজারে রয়েছে। তবে ব্যাপক পাঠক চাহিদার জন্য ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র নামক ১, ২, ৩ এবং উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর ৪র্থ শিরোনামে পুস্তক ইতোমধ্যেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এতে ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক রচিত অধিকাংশ বইয়ের সমাহার ঘটেছে। আশা করি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক মহলের অন্তরের নানা প্রশ্ন ও তার সমাধান পাবে। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি। আমিন।

জানুয়ারী, ২০১০ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা

তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে'– 'আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠান করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ শত কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ শত কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা

হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সব বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখলদারিত্ব। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু করছি ইসলামের শেখানো সম্ভাষণ রীতি– "আসসালামু আলাইকুম" বা "আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক" এ কামনা দিয়ে।

আজকের আলোচ্য বিষয়– "দাওয়াহ্ নাকি ধ্বংস" আমরা যখনই দাওয়া শব্দটি উচ্চারণ করি তখন "দাওয়াত" এর কথা মনে পড়ে। "দাওয়াত" উচ্চারণের সাথে সাথে কোন লাঞ্চ বা ডিনার পার্টির কথা আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু আমরা এখন যে দাওয়াহ্ নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হল "দাওয়াতুল ইসলাম" বা "দাওয়াতুল হক" অর্থাৎ "সত্যের পথে আহ্বান" বা "ইসলামের পথে ডাকা" এখানে কোন ভোজসভার নিমন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে না। যখন আমরা "দাওয়াতুল ইসলাম" বলি তখন এর অর্থ হচ্ছে এমন কোন ব্যক্তির নিকট ইসলামের বাণী পৌছানো যে মুসলিম নয়, অমুসলিমের নিকট ইসলামের ডাক পৌছে দেওয়াই "দাওয়াহ"।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আল-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

অর্থাৎ : "তোমরা হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি, তোমাদেরকে মানব জাতির জন্য বের করা হয়েছে।"

আমরা জানি সম্মান বা শ্রেষ্ঠত্ব এমনি এমনি আসে না। এর সাথে আসে দায়িত্বের কথা। আমরা বলি প্রধান শিক্ষকের সম্মান সহকারী প্রধান শিক্ষকের চেয়ে বেশী। আবার সহকারী প্রধান শিক্ষকের সম্মান অন্যান্য শিক্ষকের চেয়েও বেশী। অনুরূপভাবে অন্যান্য শিক্ষকের সম্মান কর্মচারীদের থেকে বেশী। আমাদের এই ধারণা আরও একটি বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। আর তা হচ্ছে– প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সহকারী প্রধান শিক্ষকের চেয়ে বেশি। যেরূপ সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকের চেয়েও বেশী। একইভাবে অন্যান্য শিক্ষকের দায়িত্ব কর্মচারীদের থেকে অধিক। এভাবে দেখা যায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই সম্মানের সাথে দায়িত্বে একটি যোগসূত্র খুঁজে পাই আর তা হলো অধিক সম্মান অধিক দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করে। তাই যখন আল্লাহ্ আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মান দিয়েছেন তেমনি

দায়িত্বও দিয়েছেন। সাথে সাথে সে দায়িত্বও বলে দিয়েছেন। আর তা হলো– "তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও আর খারাপ কাজের নিষেধ কর। তাই যখন কোন মুসলিম "ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ" এই দায়িত্ব থেকে মাথা সরিয়ে নেয় তখন সে আর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মানের অধিকারী বলে দাবি করতে পারে না। কেননা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানের জন্য যে দায়িত্ব তা সে পালন করে না। এভাবে দায়িত্বের অতি অবহেলা "খাইরা উম্মত" বা উত্তম জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে বিরত রাখে। তাই "দাওয়াহ" তথা ইসলামের দিকে আহ্বানে বিরত থাকা প্রকৃত মুসলিম তথা 'খাইরা উম্মত' হওয়ার অন্তরায়। তাই দায়িত্ব সচেতনতা তথা ভাল কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখার আঞ্জাম প্রকৃত মুমিনের সার্বক্ষণিক কর্তব্য।

আল্লাহ্ তায়ালা ভাল-মন্দের এ পার্থক্য নির্দেশ সহ মুমিনের আরেকটি গুণ উল্লেখ করে সূরা আল বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতে বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

অর্থাৎ : 'আর আমরা তোমাদের করেছি মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী। একজন মুমিন যেমন ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান করে তেমনি মন্দ কাজও চোখ বুঁজে চলতে দেয় না। কেননা মুমিন হল অন্যান্য জাতির সাক্ষী যেমনিভাবে মহানবী ﷺ হলেন মুমিনদের সাক্ষী'। অন্যান্য জাতির সাক্ষী হওয়ায় মুমিনের দায়িত্ব সব সময় মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করা। তাই মুমিন যখনই কোন অন্যায় হতে দেখে তখন সে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল আমরা মুসলিমরা আমাদের এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছি না।

পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে সামরিক নির্দেশনা দানকারী সূরা আত্ তাওবাহ। তাই এটিকে 'সামরিক' সূরাও বলা হয়। এটাকে সামরিক সূরা বলার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো এতে তাসমিয়াহ তথা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" শুরুতে অন্তর্ভুক্ত না করা। পবিত্র কোরআনের সকল সূরা যেমন : সূরা ফালাক, ইখলাস, কাফেরুন ইত্যাদি সবগুলো শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বা 'পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি' এ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা তাওবাহ এমন এক সূরা যাতে আল্লাহ্র এই দয়ালু ও দাতা গুণ উল্লেখকৃত বাক্যটি

অনুপস্থিত। তাই এটিকে সবচেয়ে বেশী 'সামরিক'। বা 'কঠোর' সূরা বলা হয়। প্রশ্ন আসতে পারে এ সূরার শুরুতে কেন 'বিসমিল্লাহ' অন্তর্ভুক্ত করা হল না। তার জবাব অত্যন্ত সহজ ও যুক্তিযুক্ত। সূরাটির শুরুর চার আয়াতে মুসলমান ও মক্কার মূর্তি পূজক পৌত্তলিকদের মধ্যকার সম্পাদিত একটি চুক্তির কথা বলা হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে চুক্তির মেয়াদ চার মাস। ইচ্ছেমত চলাফেরা করতে পারবে। তার পর যদি অবিশ্বাসীগণ ঈমান না আনে এবং বাড়াবাড়ি করে তবে তাদের শাস্তির ব্যাপারে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সূরার শুরুতেই সতর্ক বাণী তাই 'বিসমিল্লাহ্' দিয়ে শুরু করা হয়নি।

ব্যাপারটা আমরা তুলনা করতে পারি সেই অবস্থার সাথে যখন কেউ আপনার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলো আর আপনি তার পিছু ধাওয়া করলেন। এ অবস্থায় যদি আপনি তাকে ধরতে পারেন তবে কি তাকে নরম স্বরে সালাম দিয়ে কথা বলবেন? আপনি কর্কশ স্বরে অবশ্যই না বরং ধমক দিয়ে কথা বলবেন। এভাবে যেহেতু আপনি তাকে হুশিয়ার করতে চাইবেন তাই নরম স্বরে কথা বলবেন না তেমনি আল্লাহ্ও সতর্ক বাণী দিয়ে সূরা তাওবা শুরু করায় দয়া ও দাতা নাম সম্বলিত 'বিসমিল্লাহ্' দিয়ে শুরু করেন নি। এটা বাস্তবসম্মত একটি বিষয়। এভাবে আল্লাহ্ মুসলমানদের মাধ্যমে কাফিরদেরকে সতর্ক বাণী পাঠিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আল্লাহ্ সূরা আত্ তাওবার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত দু'আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশি ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান– যাকে তোমরা পছন্দ কর– তা যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।" (সূরা তাওবা : ২৩ ও ২৪)

(সূরা 'বনী ইসরাইল, এর ২৩ ও ২৪ আয়াত ও অর্থ :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

অর্থাৎ : "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে কথা বল এবং এই বলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।"

সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা নিসা এর ১০৩ ও ১০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى

الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থাৎ : "অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তাদের পশ্চাদবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত পাও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

সূরা 'বাক্বারাহ' এর ২৬১ নং আয়াত–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : "যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দয়াশীল, সর্বজ্ঞ।"

লাভের পরিমাণ রেখেছেন যা চিন্তার অতীত। আল্লাহ্ একটি দানার পরিবর্তে ৭টি ছড়া শস্য দিতে পারেন যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে একশ' বা আরও বেশি দানা। তাহলে পুরো বিষয়টি কি দাড়ালো? লাভের পরিমাণ সাতশ' গুণ থেকে সাত হাজার গুণ বা তারও বেশী আল্লাহ্ দিতে পারেন। চিন্তা করে দেখার মত বিষয় যে, এমন কোন ব্যবসা আছে যাতে সাত হাজার গুণ বা সত্তর হাজার ভাগ লাভের সম্ভাবনা আছে? আমরা যদি ব্যবসায়িক মানদণ্ডে পরিমাণ করি তবে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা সতের হাজার বা তারও অধিক হারে লাভ। আল্লাহ্‌র পথে এই লাভের সাথে আর কোন লাভ তুলনীয়? তাই আল্লাহ্ যে বিষয়গুলোকে বিশেষ মনোযোগের বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো আমাদের মাতা-পিতা, আমাদের

সন্তান, ভাই, আত্মীয়-স্বজন, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আর আমাদের বাসস্থান। আল্লাহ্ এর পরেই সতর্ক করে দেন এভাবে যে, 'যদি তোমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোকে আল্লাহ্,তাঁর রাসূল বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা থেকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাক বা বেশি মনোযোগী হও তবে তোমরা অপেক্ষা কর'। আর আমরা মুসলিমগণ আসলে চুপচাপ বসে অপেক্ষাই করছি। কিন্তু আসলে আমরা কিসের অপেক্ষা করছি? আল্লাহ্ এখানে 'অপেক্ষা কর" কথাটি বিশেষ অর্থ সহ বলেছেন। ঘটনাটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে যখন কোন সিনিয়র ছাত্র কোন জুনিয়র ছাত্রকে বলে যে, "তুমি এখানে দাঁড়াও তোমাকে দেখে নিচ্ছি"

এর অর্থ এই নয় যে জুনিয়র ছাত্রটিকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। বরং তাকে ধমকের সুরে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ও এভাবেই ধমকের সুরে বলেছেন– "তবে তোমরা অপেক্ষা কর" কিসের অপেক্ষা? এর সাথে সাথেই আল্লাহ্ সেটিও বলে দিয়েছেন আর তা হলো– আল্লাহ্র শাস্তিমূলক নির্দেশের অপেক্ষা। একদম শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহ্ বিষয়টি পুরোপুরি খোলাসা করে দিয়ে বলেছেন– "তিনি কোন ফাসেককে কখনও পছন্দ করেননা"। তাহলে আমরা কি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছি? আল্লাহ্ তায়ালা সূরা মুহাম্মদের ৩৮ নং আয়াতে বলেন–

هَآأَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا أَمْثَالَكُمْ.

অর্থ : "শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।"

এরূপ হয়েছে এবং যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেনি তখনই আল্লাহ্ তাদের উপর এমন লোকদের চাপিয়ে দিয়েছেন যারা তাদেরকে ঘৃণা করে। উদাহরণস্বরূপ ইহুদীদের কথা বলা যায় যারা আরবদেরকে সেই আদিকাল থেকেই ঘৃণা করে। অথচ যখন মুসলসমানগণ তাঁদের অর্পিত দায়িত্বকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহ্র

পথ থেকে বিচ্যুত হল তখনই ইহুদীদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা জুমার এর ৫ নং আয়াতে বলেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : "যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তাঁর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মত যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট! আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

দায়িত্ব পালন না করা ও তাঁর বর্ণিত পথ হতে বিমুখ হওয়া। যখন ইহুদীরা আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্ব পালনে অযোগ্য ও অমনোযোগী হিসেবে নিজেদের জাহির করলো তখন আল্লাহ্ আরবদের মাঝে এমন আলো ছড়িয়ে দিলেন যার ব্যপ্তি ও দীপ্তি ছিল বিশ্বময়। অন্ধকারাচ্ছন্ন আরববাসী হল নতুন আলোর বার্তাবাহক, আবির্ভূত হল মুক্তির দূত হয়ে, ছড়িয়ে পড়লো সুদূর আফ্রিকা ইউরোপ থেকে অর্ধ জাহানব্যাপী। ইউরোপের স্পেন! আজকের কোন মুসলিম জানে তাদের পূর্বসূরীদের সেই আল হামরা আজকের ইউরোপের সেরা আকর্ষণ! আটশত বছর, দীর্ঘ আটশত বছর ব্যাপী মুসলিম শাসনের যে সোনালী ইতিহাস মুসলমানদের দ্বারা রচিত হয়েছিল কালক্রমে এমন দিন আসলো একজন মানুষও পাওয়া গেল না যে স্পেনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কালেমার দাওয়াত পৌঁছে দেয়। কেন এই অধঃপতন? কারণ সেই একই, নিজেদের দায়িত্ব তথা দা'য়ী ইলাল্লাহ্ থেকে সরে আসা। আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করা। পৃথিবীতে এভাবেই আল্লাহ্ মুসলিমদের উপর অন্যদের চাপিয়ে দিয়েছেন এই এক কারণেই। ক্রুসেড এরই একটি ফল।

তাই দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা পোষণ ভিন্ন কোন গত্যন্তর নেই। একজন খাঁটি মুসলমান আল্লাহ্কে ভালবাসে তাঁর মা, বাবা, ভাই-বোন, সহায়-সম্পদ সবকিছুর উর্ধ্বে। আমরা সকলে অবশ্য মুখে বলি আমার ভালবাসা সব থেকে বেশী আল্লাহ্র প্রতি। কথাটি কতটুকু সত্য তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। আমরা আমাদের স্ত্রী, বোনকে খুব ভালবাসি। যদি আমাদের কোন প্রতিবেশী তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তবে আমরা

তার প্রতিবাদ করি, প্রতিবেশীর ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লাগি এমনকি নিজে সক্ষম না হলে অন্য লোক ভাড়া করি। তারপরও আমরা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনা। কেন আমরা এতটা উত্তেজিত হই? কারণ, আমরা আমাদের স্ত্রী, বোনদেরকে ভালবাসি। তাই যেখানেই আমরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহারকারীকে পাই তার উপর প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ্ তায়ালাও সূরা মারইয়ামের ৮৮ নং থেকে ৯২ নং আয়াতে বলেছেন–

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ـ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ـ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ـ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ـ وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ـ

অর্থ: "তারা বলে দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরাতো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। হয়তো এর কারণে এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে,পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্র জন্যে সন্তান আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় আল্লাহ্র জন্য শোভনীয় নয়।"

এখানে দেখা যাচ্ছে খ্রীস্টানরা আল্লাহ্ সম্পর্কে একটি অপবাদ দিচ্ছে যে আল্লাহ্র রয়েছে একটি সন্তান। তারা এমন একটি ভ্রান্ত অপবাদ দেয়, প্রতিক্রিয়ায় আকাশমণ্ডলী ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, সারা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চায়, আর পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা মুসলিমরা যারা কিনা দাবী করি আল্লাহ্র প্রতি আমাদের ভালবাসা সর্বোচ্চ তারা এই কটূক্তি শুনে কি করি? আমরা আমাদের স্ত্রী বা বোনদের সম্পর্কে কোন কটূক্তি শুনলে যা করি আল্লাহ্র প্রতি এত বড় অপবাদ আরোপের পরও কি আমাদের মধ্যে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, আমাদের চারপাশের খ্রীস্টান, অন্যান্য অমুসলিম বন্ধুদের প্রতি? অথচ তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্তানের অপবাদ দিয়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে নিকৃষ্টতম কটূক্তি করছে।

তাহলে আমাদের দাবী যদি সত্যিই হত যে আমরা আল্লাহ্কে আমাদের সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেই তবে কেন আমরা স্ত্রী বা বোনের সাথে দুর্ব্যবহারে যে প্রতিক্রিয়া দেখাই আল্লাহ্র ব্যাপারে তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না কেন? আমরা সবাই কেন নিশ্চুপ থাকি? তবে কি আমাদের দাবী সবটুকুই মিথ্যা নয়! আমরা কি এই

ভুল ধারণা ভাঙ্গার কোন যুক্তি তৈরি করেছি? আমাদের খ্রীস্টান বন্ধুরা বলে– "আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।" এ ব্যাপারে তারা বাইবেলের গসপেলে অব জোয়ান থেকে ৩য় অধ্যায়ের ১৫ নং আয়াতকে নির্দেশ করে বলে যে আল্লাহ্র রয়েছে পুত্র। এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে আমরা কি তাদেরকে এ আকিদার অসারতা তাদের সামনে উত্থাপন করেছি? আমরা খ্রীস্টান ভাইদের সামনে কি আসল বিশ্বাস যুক্তির সাথে পেশ করেছি? আমাদের কোন কার্যক্রম, কোন প্রস্তাবনা, কোন প্রস্তুতি কি এ ব্যাপারে আছে যার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসের বাতুলতা আমরা তাদের সামনে তুলে ধরেছি? সকল প্রশ্নের একই উত্তর আর তা হলো আমরা এ ব্যাপারে কিছুই ভাবি না। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার কোন সন্তান থাকার দাবীকে সবচেয়ে মারাত্মক কটূক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সূরা বাক্বারাহ এর ১২০ নং আয়াতে বলেন–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ـ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ـ

অর্থ: "ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ্ প্রদর্শন করেন, তাই হলো সরল পথ, যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।"

সূরা বাক্বারাহ এর ১৪১ নং আয়াত ও অর্থ–

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ: "তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রকাশিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।" সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

এ আয়াতে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের দাবী অনুযায়ী কোন মুসলিমই জান্নাত পাবে না। হ্যাঁ, আমরা মুসলিমগণ আমাদের নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত সহ অন্যান্য সকল নেক আমল সত্ত্বেও জান্নাত বঞ্চিত হব এবং তারা তাই দাবি করে। আর তাই আল্লাহ্ও তাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এর স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে। আমরা কি কখনও তাদের কাছে এর প্রমাণ চেয়েছি? কখনও চাইনি। অথচ খ্রীস্টান মিশনারী সরলমনা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে কতইনা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় দু'হাজার ভাষায়, সহজভাবে বলা যায় মোটামুটি প্রচলিত আছে এমন সকল ভাষায়, তারা বাইবেল অনুবাদ করেছে। এসব অনুবাদে তারা বেশ সূক্ষ্মভাবে মুসলমানদের মনে বিভিন্ন অমূলক সন্দেহ সৃষ্টির পায়তারা করেছে। তারা সরাসরি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণের কোন তাগিদ দেয়নি তবে এমন সন্দেহের বীজ তারা ছড়িয়েছে যা অসচেতন মুসলিমদের মনে অনাবশ্যক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যেমন তারা বলে তোমাদের নবী ﷺ এর নাম পবিত্র কোরআনে সরাসরি মাত্র পাঁচ বার আছে অথচ ঈসা মসীহ-এর নাম রয়েছে ২৫ বার। তাহলে কার সম্মান বেশী– মুহাম্মদ ﷺ নাকি ঈসা (আ)? তারা অনেক সময় বলে থাকে তোমাদের কোরআনে কি বাইবেলের কথা বলা হয়নি?

এ কথা কি তোমরা বিশ্বাস করনা যে বাইবেল আল্লাহ্র বাণী? আমরা মুসলমানরা বলি– হ্যাঁ, কোরআনে এসব কথা বলা আছে। তখন তারা আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়–তবে তোমরা কেন বাইবেল বিশ্বাস কর না? এভাবে খ্রীস্টান মিশনারীগুলো বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয়ে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। তারা এভাবে প্রশ্ন করে "তোমাদের নবী মুহম্মদ ﷺ কি কোন মৃতকে জীবিত করেছেন?" আমরা বলি– না, তাঁর অনেক মোজেযা থাকলেও মৃতকে জীবিত করার কোন ঘটনা নেই। তখন তারা বলে– 'আমাদের নবীর এমন নজির আছে।

এখন তোমরাই বল, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন আর যিনি পারেন না তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এভাবে বিভিন্নভাবে তারা সন্দেহের তীর মুসলমানদের মাথায় ঢুকাতে চায়। তারা এভাবে প্রশ্ন করে কিন্তু কোন উত্তর দেয় না বরং চায় আমাদের মাথায় নিজে থেকেই উত্তর তৈরি হয়ে যাক। কিন্তু আমরা যদি কোরআন ভালভাবে পড়ি তবে বিভ্রান্ত হবার কোন অবকাশ আছে? অবশ্যই নাই। আল্লাহ্ সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ: বলুন : "হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস–যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান– যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, তোমরা 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।"

এখানে আল্লাহ্ শুরুতেই মুসলমানদেরকে বলেছেন– বল বা ঘোষণা দাও। এই যে বলা বা ঘোষণা দেয়া এটাতো মুসলিমরাই করবে। কিন্তু কার কাছে বলবে? কাকে ঘোষণা দিবে? আহলে কিতাব তথা ইহুদী, খ্রীস্টান বা অন্যান্য অমুসলিমদের নিকট। ঘোষণাটি সুস্পষ্ট আর তা হলো– আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো মা'বুদ মানি না। আমরা কি এ ঘোষণা দেই? আমরা কি এ কথা, এ দাওয়াত, এ আহ্বান কোন অমুসলিম ভাই, প্রতিবেশী বা বন্ধুর নিকট পৌঁছাই? না, আমরা দ্বীনের এ দাওয়াত তাদের কাছে নিয়ে যাই না। আমরা বড়জোড় সালাহ আদায় করি। আমরা যখন সালাত আদায়ে মসজিদে যাই তখন ইমাম সাহেব কি পড়েন বা তেলাওয়াত করেন? তিনি তেলাওয়াত করেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

অর্থ : "বল তিনি আল্লাহ্ এক"

এই যে বলা এই যে ঘোষণা, এই যে এলান এটা কাদের কাছে? অবশ্যই অমুসলিমদের নিকট আমাদের এ যে ঘোষণা পৌঁছাতে হবে। ইমাম সাহেব আরো তেলাওয়াত করেন–

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : "তিনি কাউকে জন্ম দেননি আবার তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"

এই যে ঘোষণা– "তিনি কাউকে জন্ম দেননি আবার তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। এ ঘোষণা কি খ্রীস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়? তারা আল্লাহ্‌র প্রতি যে অপবাদ দেয়, তার বিরোধী নয়? অবশ্যই তাদের দাবী কে প্রত্যাখ্যান করে কোরআনের এই আয়াত। তাই আল্লাহ্ এ মুসলিমদের বলেছেন তোমরা এটা বল সব অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের নিকট। আমরা এ আদেশের কতটুকু বাস্তবায়ন করেছি? অথচ অমুসলিমরা বসে নেই। আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের কথা বললে অনেক মুসলিম ভাই বলেন যে, যিনি ইসলাম সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখেন না তিনি আলেম নন। কিন্তু দাওয়াহ ইলাল্লাহ্‌র এই ফরজ দায়িত্ব এটা কি শুধু আলেমদের জন্য? আমি আলেম নই এটা বলে দায়িত্ব এড়ানোর কোন সুযোগ নেই। মহানবী ﷺ নিজেই বলেছেন–

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً -

অর্থাৎ, "মানুষের কাছে পৌঁছে দাও আমার কথা হোক না তা একটা।"

তাই ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছানোর দায়িত্ব সকলের তা সে যত ছোটই হোক না কেন। আপনি আর কিছু হোক এতটুকু তো জানেন যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। আপনার এই জানাটুকুই আপনি কোন অমুসলিমের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন কি? যদি শুরু করেন তবে পথ পেয়ে যাবেন এবং আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন। আপনি যখন মনস্থির করবেন যে, মহানবী ﷺ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এ দাওয়াত কারো কাছে পৌঁছে দেবেন তখন নিজে থেকেই আপনি এ তাগিদ অনুভব করবেন যে কিভাবে এটি প্রমাণ করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞান আমাকে অর্জন করতে হবে। এভাবে আপনি একজন পরীক্ষার্থীর মত হয়ে যাবেন। একজন পরীক্ষার্থী কি এটা বলে বসে থাকে যে সে কিছু জানে না।

তাই পরীক্ষাও দেবে না? না, তা কেউ করে না। বরং পরীক্ষায় বসার আগে ঠিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। এভাবে যদি আপনি কোন অমুসলিমকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী তথা তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পবিত্র কোরআনের সত্যাসত্য, শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝানোর জন্য মনস্থির করে থাকেন তবে নিজ থেকেই পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এ সমস্ত বিষয় আপনি আগে থেকেই জেনে নেয়ার তাগিদ অনুভব করবেন। আর আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তা অর্জন খুব একটা ব্যাপার নয়। মিডিয়া ইসলামী টি,ভি, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট,

সিডি ইত্যাদি বহুকিছু আপনি হাতের নাগালে পাবেন যা থেকে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো বিস্তারিত আপনি জেনে যাবেন। অতএব আমি জানিনা, আমি আলেম নই, আলেম হলে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্র পথে মানুষকে ডাকবো ইত্যাদি অযৌক্তিক অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ এখানে নেই। কে আপনাকে বলেছে যে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের দায়িত্ব শুধু আলেমের? আমরা যখন সালাত আদায় করি তখন তা শুধু আনুষ্ঠানিকতারই পালন করি; এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝি না। সালাতে ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করেন– "বল তিনি আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।" এখানে আল্লাহ্ বলেন নি– বিশ্বাস কর আল্লাহ্ এক" বরং বিশ্বাস তো করতেই হবে সেই সাথে যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে বলতেও হবে। যে খ্রীস্টান সম্প্রদায় আল্লাহ্র প্রতি সন্তান থাকার অপবাদ দেয় তাদেরকে বলতে হবে– "আর তাঁর কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। এ বিশ্বাসগুলো থাকলেই চলবে না বরং অবিশ্বাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাই আল্লাহ্ বলেছেন–

'বল' অতএব দায়িত্বে গাফিলতির কোন অবকাশ নেই। বরং আপনি একটি একটি করে বিষয় বুঝানোর প্রস্তুতি নিন এবং সে বিষয়ে মাস্টার বা শিক্ষক হয়ে যান।

অনেকে আবার অন্য আরেক ধরনের যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ বা দাওয়াহ ইলাল ইসলাম তথা আল্লাহ্ ও ইসলামের প্রতি আহ্বানের যে দায়িত্ব সেটা মুসলমানদের মাধ্যমে শুরু করি আগে। তাঁরা যুক্তি দেন আগে মুসলমানকে পাক্কা,খাঁটি বা খালেছ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দাওয়াত দেই। পরে অমুসলিমদের দাওয়াত দিব। আপনি যদি বিশ্বের সকল মুসলিমের ইসলাহের বা সংস্কারের আশায় বসে থাকেন আর অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকেন তবে ইহজীবনে আর সে সুযোগ আসবে না। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কি করেছেন? তাঁর আপন চাচা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই বলে কি তিনি অন্যের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেন নি? তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ইসলামে দাখিল হওয়ার অপেক্ষায় বসে ছিলেন? অবশ্যই তিনি বসে ছিলেন না।

মহানবী ﷺ যখন বসে থাকেন নি আপনি কিভাবে সে ব্যাপারে আপত্তি করবেন? মুসলমানের নিকট আপনি তার ইসলাহের জন্য অবশ্যই ইসলামের বিভিন্ন বিষয় পৌঁছে দেবেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুসলিম পাক্কা মুসলিম না হচ্ছে ততক্ষণ অমুসলিমের নিকট দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাব না। আপনি কি নবী ﷺ হতে উত্তম দাওয়াত দানকারী? অথচ নবী ﷺ বলেছেন

মদীনায় অনেক মুসলিম আছে যারা জামাতে সালাত আদায় করে না, ইচ্ছা হয় তাদের ঘর পুড়িয়ে দেই। দেখুন নবী ﷺ জানতেন মদীনার সকল মুসলিমই জামাতে সালাত আদায় করে না এবং এজন্য তাঁর কষ্টও হত তার পরও কি তিনি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাননি? তিনি কি পারসিয়া, বাইজানটাইন ইত্যাদি রাজ্যের অমুসলিম বাদশাহদের কাছে ইসলামের বার্তাবাহী পত্র লেখার সময় মদীনার সকল মুসলিমের ইসলাহের প্রতীক্ষায় ছিলেন? তিনি যদি সেটা না করেন তবে আপনি, আমি কোন যুক্তিতে এটা করতে পারি?

আবার প্রথম দলের লোকের কথা যারা কিনা বলে আমি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, আমি কিভাবে আবার অমুসলিমকে দাওয়াত দিব। এ দলের কথা পুনরায় উল্লেখ করার কারণ এ দলের সদস্য সংখ্যা বেশী অর্থাৎ অধিকাংশ মুসলিম দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ হতে মুক্ত থাকার জন্য এ অজুহাত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম তো কমপক্ষে দুটি জিনিস জানে, আর তা হলো– আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই আর দ্বিতীয় কথাটি হল মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল।

আপনি এ দুটো বিষয় আগে জানান অমুসলিম ভাই বা বন্ধুকে। হ্যাঁ, তখন সে এর পক্ষে প্রমাণ চাইবে। তখন বাড়ি চলে আসুন, প্রস্তুতি নিন এবং তারপর যুক্তি তুলে ধরুন। আমি আগেও উল্লেখ করেছি এসব বিষয়ে হাজার হাজার বক্তৃতার ক্যাসেট পাবেন, সিডি পাবেন যা আপনাকে এসব বিষয়ে একজন পণ্ডিত করে দেবে। এরপর আসুন আরেকটি বিষয়ে যেমন কোরআন আল্লাহ্র বাণী কিনা। এ বিষয়েও অকাট্য প্রমাণ সহ অনেক ক্যাসেট সিডি আছে যা যৌক্তিকভাবে প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিম তথা হিন্দু, খ্রীস্টান সকলকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেবে যে কোরআন আল্লাহ্র বাণী। আপনি যখন এটিও বললেন তিনটি বিষয় বিস্তারিত জেনে গেলেন। এভাবে যতদিন যাবে ততই জ্ঞানের বিস্তৃতি বাড়বে। তাই জানিনা বলে বসে থাকার সুযোগ নেই।

এবার নজর দেয়া যাক আর একটি পক্ষের কথা যারা দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ থেকে নিজেকে দূরে রাখার অন্য আরেকটি খোঁড়া অজুহাত পেশ করে থাকে। তারা বলেন আগে নিজে ঠিক হই পরে অন্যকে দাওয়াত দিব। আপনি যদি এ যুক্তিতে বসে থাকেন তবে নিশ্চিত থাকুন কোন দিনই আর আপনার দ্বারা দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ হবে না। ব্যাপারটা বরং উল্টো। আপনি যখনই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন শুরু করবেন তখন আপনি নিজে থেকেই পাল্টে যাবেন। আপনি একটু একটু করে নিজেই বদলে হয়ে যাবেন খাঁটি মুসলিম। তাই নিজেকে ঠিক করার অপেক্ষায় না

থেকে দাওয়াতের কাজ শুরু করুন দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনি ঠিক হয়ে গেছেন।

এবার আসা যাক এমন কিছু লোক সম্পর্কে যারা আল্লাহ্‌র পথে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অবহেলা ও এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত হিসেবে স্বয়ং কোরআনকে ব্যবহার করে ও এ থেকে উদ্ধৃতি দেয়। কোরআনের ভুল ও অপব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা যে দোহাই দেয় তা হাস্যকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাদের মধ্যে একটি পক্ষ আছে যারা দাওয়াতের মহান দায়িত্ব এড়াতে পবিত্র কোরআনের সূরা কাফেরুন এর শেষ আয়াত উল্লেখ করে। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা কাফেরুন এর শেষ আয়াতে বলেন–

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ -

অর্থ: "তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।"

এ দলটি বলতে চায়, যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই বলছেন যার যার ধর্ম তার তার কাছে অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে। এইভাবে আল্লাহ্ তায়ালা অন্যের ধর্ম নিয়ে কোন মাথাব্যথা না করা বা নাক গলানো থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। যেহেতু এভাবে অন্যের ধর্ম নিয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার কথা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, আমরা কিভাবে অন্য ধর্মবলম্বীদের কাছে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিব?

যারা এভাবে দায়িত্ব এড়ানোর অপকৌশল খোঁজে তারা পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করে। প্রকৃতপক্ষে আয়াতটির সাথে পুরো সূরার একটি সংযোগ রয়েছে। পুরো সূরাটি না তেলাওয়াত করলে এবং পূর্বের আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্যতা না আনলে কোনভাবেই মূলভাব বুঝা যাবে না। দেখা যাক পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ কি নির্দেশ করেছেন। শুরুতেই আল্লাহ্ বলেন– সূরা 'কাফিরুন' এর অর্থ

(১) "বলুন! হে কাফেরকুল; (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর। (৩) এবং তোমরাও এবাতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৪) এবং আমি এবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা এবাদকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।"

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ প্রথমেই নির্দেশ দিয়েছেন– 'বল' যারা বলেন যে যার যার ধর্ম তার তার কাছে তাই– অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌছানোর আর প্রয়োজন নাই– তাদেরকে বলি তবে আল্লাহ্ প্রথমেই কেন বললেন– "বল হে কাফেরেরা!" আল্লাহ্ কি বলেননি অবিশ্বাসীদের কিছু বলতে? তাদের নিকট দাওয়াত পৌছে দিতে? এরপরের আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ .

অর্থ: আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর।

তাহলে যা দাঁড়াল তা হচ্ছে, আমাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন অবিশ্বাসীদের বলতে আমরা যার ইবাদত বা দাসত্ব করি তারা তার দাসত্ব করে না। আমরা কার দাসত্ব করি? মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব আমাদের কাঁধে। আমরা কি এ বার্তা অমুসলিমদের কাছে পৌছে দিয়েছি? অথচ আল্লাহ্ কি প্রথম দু' আয়াতে এ নির্দেশই দেননি? তাহলে "যার যার ধর্ম তার তার কাছে" এ দোহাই দিয়ে কিভাবে দাওয়াতের আঞ্জাম থেকে আপনি নিষ্কৃতি আশা করেন? চলুন, দেখা যাক আল্লাহ্ এরপর এ সূরাতে আরো কি কি বার্তা আমাদের দিচ্ছেন। এ সূরার তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ .

অর্থ: "এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি।"

এখন দেখা যাচ্ছে, অবিশ্বাসী ও অমুসলিমগণ তাঁর দাসত্ব করবে না, আমরা মুসলিমগণ যার দাসত্ব করি। তাহলে তারা কার দাসত্ব করে? আমরা কার দাসত্ব করি? আমাদের ও তাদের তাবেদারীর মধ্যে পার্থক্য কি? কেন আমরা যারা তার দাসত্ব করি তারা তার দাসত্ব করবে না এ সকল বিষয় কি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করলে দাবী এসে যায় না এসব আয়াতের আলোকে? আমরা কি সে দায়িত্ব পালন করেছি? আর এ দায়িত্ব পালন করতে গেলেই দাওয়াত ইলাল্লাহ্ ও দাওয়াত ইলাল ইসলামের কর্তব্য পালিত হয়। সূরা কাফেরুন এর পরের আয়াতগুলোতেও আল্লাহ্ একথাগুলোই বলেছেন। যেমন চতুর্থ আয়াতে বলেন–

وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ .

অর্থ: "এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর।"

পঞ্চম আয়াতে বলেন–

وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۔

অর্থ: "তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি।"

এভাবে যদি পূর্বাপর আয়াতগুলো এক সাথে বিশ্লেষণ করা হয় তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অমুসলিমদের নিকট অবশ্যই আগে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। যদি তারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তবে তারা যার অনুগামী ও পূজারী তাদের সাথে মুসলিমদের আল্লাহ্‌র দাসত্বের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তা বিশ্লেষণপূর্বক কেন মুসলমানদের পক্ষে অমুসলিমদের অনুসরণ সম্ভব নয় তা বুঝাতে হবে। এরপরও যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তবে সব শেষে আল্লাহ্‌র ফায়সালা হল– তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম ও কর্ম আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম ও কর্ম। এটা হল সর্বশেষ অবস্থা। আমরা কি এ শেষ পর্যায়ে পৌঁছার পূর্বের ধাপগুলো অনুসরণ করেছি? নাকি দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল হিসেবে শুধু শেষের আয়াতটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার মিথ্যা প্রয়াস পাচ্ছি? শেষের আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করে বিভ্রান্ত করার বা হওয়ার সুযোগ নেই বরং আয়াতটি আসল "কনটেক্সট" বা পুরো সূরার প্রেক্ষাপটে ভাবতে হবে। তা না হলে ভুল বা অপব্যাখ্যার অবকাশ থাকে যার মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এড়ানোর অপকৌশল খোঁজার জন্য মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে আর কোন ভ্রান্তি নেই বলেই এখন আমার বিশ্বাস।

এরপর আসা যাক কোরআনের আরেকটি আয়াতের ব্যাপারে যে আয়াতটির দোহাই দিয়েও অনেক মুসলিম দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে চায়। এক্ষেত্রে তারা সূরা বাক্বারাহ-এর ২৫৬ নং আয়াতটির প্রথম অংশ তুলে ধরে যেখানে বলা হয়েছে–

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۔

অর্থাৎ : "ধর্মে বা দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নাই।"

কিছু মুসলিম আছেন যারা যুক্তি দেন যেহেতু দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই তাই যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে এখানে কোন মুসলিমের দায়িত্ব নাই অন্য অমুসলিমকে ইসলাম সম্পর্কে জানাবে। কিন্তু আয়াতটি কি সেই অর্থ দেয়? চলুন পুরো আয়াত ও তার পরের আয়াতটি দেখি সেখানে কি বলা হয়েছে,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থ: (২০৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণা করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়,আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـــهُمُ الطَّاغُـوْتُ يُخْرِجُـوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফুরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই এ কথা বলার পরেই উল্লেখ করা হয়েছে সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এই সত্য পথ অর্থাৎ ইসলাম ভ্রান্ত পথ তথা কুফুরী ও শিরক থেকে পৃথক এটা কি আপনি অমুসলিমদের বুঝিয়েছেন? কেন শুধু প্রথম অংশ তেলাওয়াত করে দায়িত্ব এড়ানোর এ অপচেষ্টা। উপরন্তু আল্লাহ্ তায়ালা পরবর্তী আয়াতেই বলছেন আল্লাহ্ মুমিনগণকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন আর তাগুতি শক্তি অবিশ্বাসীদের আলো থেকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়। এখন আপনি বলুন আপনি নিজে কোন পক্ষে। যে পক্ষ আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত সেই পক্ষে নাকি যে দল অন্ধকার থেকে আলোর পথের যাত্রী সেই দলের। যদি অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথের যাত্রী আপনি হতে চান তবে আপনি কত জনের কাছে সে

আলো পৌঁছে দিয়েছেন সে প্রশ্নটি কি আসে না? অতএব দাওয়াত ইলাল্লাহ্ থেকে পিছু টান দেবার কোন সুযোগ নাই।

যখনই আপনি খাঁটি মুসলিম হিসাবে নিজেকে গড়তে চাইবেন তখনই দাওয়াত এর দাবী পূরণ বাধ্যতামূলক। হ্যাঁ এটা ঠিক, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নাই, তবে দাওয়াতটা পৌঁছাতে হবে। দ্বীনের আলো, বার্তা, আহ্বান আপনি অমুসলিমদের কাছে পৌঁছান। এরপর সে প্রত্যাখ্যান করলে আর আপনার বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই। তখন আর জোর জবরদস্তির প্রয়োজন নেই তবে তার আগে অবশ্যই দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। অতএব কোরআনের আয়াত আংশিক নয় বরং পরিপূর্ণভাবে তেলাওয়াত করুন এবং বুঝুন। তখন দেখবেন আর ভ্রান্তি থাকবে না। দায়িত্ব পালনে তখন আর পিছুটান থাকবে না।

আজকের যুগে আরেকটি নতুন দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা। তারা যুক্তি দেন ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপার। এখানে অন্যের হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। তাদের ব্যাপারে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ধরা যাক, আপনি আপনার সন্তান, স্ত্রী সহ কোথাও যাচ্ছেন। হঠাৎ আপনার তিন-চার বছরের বাচ্চাটিকে খুঁজে পেলেন না। এদিক সেদিক তাকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে যখন চোখে পড়লো তখন সে আপনার নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে। আপনি তাকে ছোট বিন্দুর মত দেখছেন। আপনার নজরে আসলো আপনার ছেলের পাশেই একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তার কাজ করছেন। লোকটি আপনার সন্তানকে বিপজ্জনকভাবে হাঁটতে দেখছে কিন্তু তাকে বাঁধা দিচ্ছে না। আপনার সন্তান ঢালু থেকে নিচে পড়ে যে কোন সময় মারা যেতে পারে দেখেও লোকটি কোন পদক্ষেপ নিল না এবং ঘটনাচক্রে আপনার সন্তান সত্যই ঐভাবে মারা গেল।

এখন আপানি কি লোকটিকে অপরাধী বলবেন না? লোকটি যদি দাবী করে যে, সে ছেলেটিকে বাঁচাবে কি বাঁচাবে না তা তার ব্যক্তিগত এখতিয়ার তাহলে কি আপনি এটা গ্রহণ করবেন? লোকটিকে কি আপনি অপরাধী হিসেবে গণ্য করবেন না? একইভাবে হাশরের দিন আল্লাহ্ তায়ালা অমুসলিমদের বলবেন দুনিয়াতে তুমি কি আমার বাণী পাওনি? যেহেতু তুমি আমার বাণী গ্রহণ করনি জাহান্নাম তোমার একমাত্র স্থান। এই কথা বলে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে ধাবিত করবেন। এরপর মুসলিমদের বলবেন তোমরা কি তাদের সতর্ক কর নাই? যদি না কর তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ কর। অতএব দাওয়াত এর দায়িত্ব অবহেলার কোন

সুযোগ নাই। শেষ বিচারের সেই দিন অবিশ্বাসীরা মুসলিম প্রতিবেশী, বন্ধু ও পরিচিতজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বলবে এই মানুষগুলো আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র ও দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয় নি। আল্লাহ্ তাদের সে অভিযোগ আমলে নিয়ে আল্লাহ্ মুসলিমদের নিকট এর জবাব চাইবেন। যারা জবাব দিতে পারবে না আল্লাহ্ তাদের বলবেন– "যাও তোমরাও ঐ অবিশ্বাসীদের সাথে জাহান্নাম তোমাদের মনজিল।" আমরা কি অমুসলিমদের ঐ নালিশের কৈফিয়ত দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি?

এখন প্রশ্ন থাকতে পারে যদি মুসলিমকে দাওয়াত না পৌঁছানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তবে অমুসলিমকে কেন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে? এর কারণ হচ্ছে মুসলিমের প্রতি যেমন দাওয়াত ইলাল্লাহ্ ও দাওয়াত ইলাদদ্বীন ফরজ তেমনি সত্য পথ খুঁজে নেয়া অমুসলিমদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। তাই সত্য খুঁজে নেয়া আর সত্যের আহ্বান পৌঁছে দেয়া দু'টোই দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আল আছর এ বলেছেন–

وَالْعَصْرِ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

অর্থ: (১) কসম যুগের (২) নিশ্চয় মানুষ **ক্ষতিগ্রস্ত;** (৩) **কিন্তু তারা নয়,** যারা **বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ** দেয় ও **ধৈর্য্যের উপদেশ** দেয়।

দেখুন, এ সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ সময়ের 'কসম' বা শপথ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আসমান, জয়তুন বিভিন্ন বিষয়ের শপথ বিভিন্ন সময়ে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে করেছেন। কিন্তু এখানে সময়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শপথের পর তিনি একটি অতীব ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়ের অবতারনা করেছেন। তিনি বলেছেন– সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে। হ্যাঁ, সমস্ত মানুষ তা সে মুসলিম, অমুসলিম সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-মূর্খ, ইংরেজ-বাঙ্গালী, আরবী, ধনী-গরীব সকল বিভাগ নির্বিশেষে সকলেই ক্ষতির মুখোমুখি। তবে কারা ক্ষতির বাইরে? কি এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি? হ্যাঁ, আল্লাহ্ এর পরেই বলেছেন যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, মানুষকে সত্যের পথে অর্থাৎ ইসলামের পথে আহ্বান করে বা দাওয়াত ইলাল-ইসলাম এর দায়িত্ব পালন করে। এবং চতুর্থ হল ধৈর্য্যের কথা মানুষকে বলা। এই যে চারটি দায়িত্ব এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া না হওয়া বা জান্নাতী

বা জাহান্নামী হওয়া না হওয়ার সর্বনিম্ন মাপকাঠি। এই চারটি কোন একটি বাদ দিলে জান্নাতী হওয়ার কোন উপায় থাকবে না, তাই এই চারটি দায়িত্বের কোন একটি ছেড়ে দেয়া বা অবহেলা করার ন্যূনতম সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে আর কার কথা সর্বোত্তম যে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করে।"

এখানে আল্লাহ্ নিজেই সার্টিফায়েড করছেন যে, আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানই সর্বোত্তম কথা। তাই এ দায়িত্ব অবহেলার কোন সুযোগ নাই। আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহ্বান করার জন্য অবশ্যই প্রত্যেক মুসলিম তার দৈনন্দিন কর্মের কিছু অংশ ব্যয় করবে। এটাই বাধ্য-বাধকতা। অবশ্য আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি দাওয়াত পৌঁছানোর দু'টি দল থাকবে। একটি দল তাদের সারা জীবন দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ এর আঞ্জাম দিবে। আর বাকী সকল মুসলিম তাদের দৈনন্দিন সময় থেকে কিছু অংশ বের করে নেবে আল্লাহ্র রাস্তায় মানুষকে আহ্বানের নিমিত্তে। আল্লাহ্ সূরা আলে-ইমরান-এর ১০৪ নং আয়াতে বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের আদেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করবে; ইহারাই সফলকাম।"

লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি মিশনারী দল গঠন করার কথা বলেছেন যে দলের লোকের প্রত্যেকটি সদস্য তাদের পূর্ণ জীবনের প্রতিটি ক্ষণ বা সময় আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহ্বান করতে থাকবে। আমরা কি এমন মিশনারী দল গঠন করেছি? আল্লাহ্ তায়ালা যেমন প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রতিদিনের কিছু অংশ দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র জন্য ব্যয় করতে বলেছেন তেমনি এমন একটি দল গড়তে বলেছেন যার প্রত্যেক সদস্য সারা জীবন আল্লাহ্র পথে আহ্বানে ব্যয় করবে। এই দলটি যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ প্রতিটি মুসলিম করবে। আমাদের যেমন ফুলটাইম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন তেমনি ফুলটাইম দায়ী ইলাল্লাহ্ও প্রয়োজন। আমরা যেটা করে থাকি তা হলো যে সন্তান পরীক্ষায় ফেল করে বা পঙ্গু বা নির্বোধ তাকে মাদরাসায় দেয়ার চিন্তা করি। আর ভাল, সবল ও মেধাবী হলে তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার করার কথা ভাবি। অথচ ফুলটাইম

দায়ীরা হবে সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে সবল ও সবচেয়ে কর্মক্ষম। আমরা যা করি তা পুরোপুরি উল্টো, আমরা মনে করি মাদরাসায় পড়াশোনা করা তেমন কোন সফলতার বিষয় নয় যে এর জন্য অধিক মেধাবী সন্তানদের এখানে দিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আত তাওবাহ-এর ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থ: "তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।"

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে রাসূল ﷺ -কে এমন যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তিনি দ্বীন ইসলামকে সকল ধর্মের চেয়ে উত্তম হিসেবে উপস্থাপনার ক্ষমতা রাখেন। এমন ক্ষমতা অবশ্যই তাদের থাকতে হবে যারা তাদের পুরো জীবনই দায়ী ইলাল্লাহ্'র কাজে ব্যয় করবে। অতএব মেধাবীদেরই ইসলামী মিশনারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সকল মুসলিম অবশ্যই এর জন্য সকল ব্যয় নির্বাহ সহ অন্য সকল আঞ্জাম দেবে।

একইভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আল ফাতহ্-এর ২৮ নং আয়াতে বলেছেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

অর্থ : 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। আল্লাহ্ সাক্ষ্যদাতা হিসাবে যথেষ্ট।"

এখানেও একইভাবে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল ﷺ এর সেই সক্ষমতার কথা বলেছেন যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষী হওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। দেখুন, যেখানে আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষী হওয়ার কথা বলেছেন সেখানে আমরা কিভাবে সংশয় রাখি? আমরা কেন আমাদের সবচেয়ে মেধাবী সন্তানকে দায়ী ইলাল্লাহ্ রূপে গড়ে তুলি না? তবে কি আমরা শুধু কোরআন তেলাওয়াত করি ও মুখে বলি আমরা এটি বিশ্বাস করি

কিন্তু অন্তর থেকে বিশ্বাস নিয়ে শিথিলতা আছে? আপনাকে যদি কেউ কোন ব্যবসায় সাতশত হাজার পূর্ণ লাভের কথা বলে তবে কি আপনি তা করবেন না? অবশ্যই সে ব্যবসায় আপনি আপনার সর্বশেষ পয়সাটিও বিনিয়োগ করবেন। আর যদি এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চয়তা দেয় তবে কে তার সর্বশেষ পয়সাটি বিনিয়োগ করতে বিলম্ব করবে? সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র কোরআনে সাতশত হাজার গুণ লাভের কথা বলেছেন এবং নিজেই এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তবে কেন আমরা এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করছি না? তবে কি আমাদের বিশ্বাস শুধু মুখের কথা? এ বিষয়গুলো আমাদের পুনরায় ভাবতে হবে। যা হোক শেষ পর্যায়ে এসে আমরা স্মরণ করতে পারি পবিত্র কোরআনের সূরা আন নাহ্ল এর ১২৫নং আয়াতে বলেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।"

আল্লাহ্ আমাদেরকে কোরআন বুঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

"দাওয়াত ইলাল্লাহ্ অর ডিস্ট্রাকশন" এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নোত্তর পর্বের পালা এবার। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসু মানুষের প্রশ্নগুলো আসতে থাকবে একে একে উত্তর নামক পানিদ্বারা জিজ্ঞাসার পিপাসাকে মিটিয়ে দিতে। তাহলে এখন আসা যাক প্রশ্নোত্তর পর্বে, যা নিঃসন্দেহে আলোচনার একটি বাড়তি আকর্ষণও বটে।

প্রশ্ন : ৩১৮। আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ফুলটাইম বা সার্বক্ষণিক দায়ী ইলাল্লাহ্ হতে চাই। এখন আমি কি করতে পারি বা কোথায় যাওয়া উচিত? আবার যদি কেউ তার সন্তানকে সার্বক্ষণিক দায়ী ইলাল ইসলাম করতে চান তবে তিনি তার সন্তানকে কিভাবে গড়ে তুলবেন?

উত্তর : আল-হামদুলিল্লাহ্, কেউ যদি নিজে ফুলটাইম দায়ী ইলাল্লাহ্ হতে চায় তবে তাকে স্বাগতম। তবে তাকে কি করতে হবে তা সরাসরি বলা সম্ভব নয়। কারণ তার অবস্থান কোথায় বা তার আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও অজানা। যদি তিনি বম্বের হন তবে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে দাওয়াহ্ সেন্টার আছে যেখান থেকে তিনি প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। বোম্বে ছাড়াও জেদ্দা সহ বিভিন্ন স্থানে অনেক দাওয়াহ্ সেন্টার আছে সেখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার নিজের এলাকায় ফিরে আসতে পারেন দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্তে।

আমাদের এখানে, বোম্বে, শিশুদেরও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যারা পার্টটাইম দায়ী হিসাবে কাজ করতে চায় তাদের জন্য সপ্তাহের তিনদিন– শনি, রবি, সোম, বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব যা থেকে প্রশিক্ষন গ্রহণকারীগণ নিজে থেকে উত্তর দেবার উপায় খুঁজে পায়। এই প্রশিক্ষণ পর্বে বিভিন্ন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পার্টটাইম দায়ী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাছাড়া ফুলটাইম দায়ীদের বিভিন্ন বিষয় এমনকি কথা বলার সময় মাইক্রোফোনে কতটুকু দূরে থাকবে সে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। মনে রাখবেন ফুলটাইম দায়ী অর্থ ফুলটাইম ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যেমন ফুলটাইম কোর্স সম্পন্ন করতে হয় তেমনি ফুলটাইম দায়ী হওয়ার কোর্স করতে হয়। এখানে শেখানো হয় কিভাবে যৌক্তিকভাবে প্রশ্নোত্তর করতে হয়। কিভাবে কোরআন থেকে হাদিস থেকে, বাইবেল থেকে ইঞ্জিল থেকে কোটেশন নিতে হয়। এগুলো কিভাবে মুখস্ত করতে হয়।

আমাদের বোম্বে দাওয়াহ সেন্টারে, আল হামদুলিল্লাহ্, ৬-৭ জন ফুলটাইম দায়ী বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয় মুখস্ত করেছেন যার দ্বারা তারা জেদ্দায় গিয়ে ভালভাবে দাওয়াতের কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। বোম্বেতে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হচ্ছে দাওয়াতের প্রশিক্ষণের জন্য এবং একই সাথে শিশুদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ বিভাগ। আমরা শিশুদেরকে একদম প্রথম পর্যায় থেকেই ইসলামী প্রশিক্ষণ দিতে চাই। অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শুরুতে ডলার বা অর্থ উপার্জনের রাস্তা দেখায় আমরা সেখানে পূর্ণ উপার্জনের পথও বাতলে দেব। শিশুদের জন্য বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী মনোভাব গড়ে তোলা হবে। মনে রাখবেন, ইহলোকিক লাভ-ক্ষতির জ্ঞান যেমন প্রয়োজন পারলৌকিক লাভ-ক্ষতির জ্ঞানও তেমনি অপরিহার্য। আমরা শিশুদের কোন একটি নয় বরং উভয়ের মিশ্রণে পূর্ণাঙ্গমানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সে ভাবেই একটি বিভাগ খোলা হবে যা থাকবে সম্পূর্ণ শিশু বিষয়ক। আশা করি উত্তর দেয়া হয়েছে। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৩১৯। আসসালামু আলাইকুম। আমি ওমর ফারুক। আমার তিনটি প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যখন খ্রিস্টানরা যিশুকে মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে তখন কি যুক্তিতে তাদের জবাব দেয়া যায়?

উত্তর : দেখুন, আপনি তিনটি প্রশ্নের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে অনেক মানুষের প্রশ্ন করার আছে। তাই প্রথমে শুধু প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেব এবং সবশেষে সময় থাকলে বাকীগুলোরও জবাব পাবেন। আগেই বলা হয়েছে খ্রিস্টানরা বিভিন্নভাবে অমুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলে যে, যীশু মুহাম্মদ ﷺ থেকে শ্রেষ্ঠ। তারা বলে মুহাম্মদ ﷺ এর পিতা মানুষ কিন্তু যীশুর পিতা স্বয়ং খোদা। তাদের আপনি বলুন সূরা আলে-ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۔

অর্থ : আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয় ঈসার দ্রষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সাদৃশ। তিনি তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন; অতঃপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।

তাহলে কোরআন বলছে ঈসা আল্লাহ্‌র সন্তান নয় বরং আদমের মত মাটি থেকে সৃষ্ট। আর আল্লাহ্ যদি আদমকে মাতা-পিতা উভয়হীন থেকে সৃষ্টি করতে পারেন তবে ঈসা বা জেসাসকে শুধু মাতা থেকে সৃষ্টি করতে বাধা কোথায়? অতএব, তিনি যে আল্লাহ্‌র পুত্র নন এবং এর সুবাদে মুহাম্মদ ﷺ থেকে শ্রেষ্ঠ নন এটি প্রমাণিত।

এখন তাদের কেউ কেউ বলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ এর পিতা ও মাতা উভয় থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিয়েছেন অথচ যীশু বা জেসাস বা ঈসা যাই বলি না কেন তাকে শুধু মাতা থেকে বিশেষভাবে জন্ম দিয়েছেন তাই তিনি মুহাম্মদ ﷺ থেকেও বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তাদেরকে এর জবাবে যুক্তি তুলে ধরে বলতে পারেন মাতা-পিতা কার উপস্থিতিতে জন্ম নিল এটা যদি বিশেষত্বের বা সম্মানের মাপকাঠি হয় তবে তো আদম (আ) সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী কারণ তিনি সৃষ্ট না পিতা থেকে না মাতা থেকে কিন্তু ঈসা (আ) তো মাতা হলেও আছেন। তবে কি তারা এটা মানেন যে ঈসা (আ) থেকে আদম (আ) শ্রেষ্ঠ? যে যুক্তিতে মুহাম্মদ ﷺ থেকে ঈসা (আ)কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে সেই যুক্তিতে আদম (আ)কে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়? তবে কি তাদের যুক্তি অযৌক্তিক নয়? এছাড়াও তাদের ধর্ম গ্রন্থে সলোমন নামক রাজার উল্লেখ আছে যারও পিতা-মাতা সন্তান কিছুই নাই। তারা কি তাকেও ঈসা (আ) বা যীশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেবে? যদি তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ব্যক্তিকেই নিজেদের যুক্তি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ বলে মেনে না নেয় তবে আর সে যুক্তিকে মূল্য দেয়ার কোন অর্থ হয় না।

এখন ধরুন তাদের দ্বিতীয় যুক্তির কথা যেখানে তারা বলে পবিত্র কোরআনে ঈসা (আ) এর নাম এসেছে পঁচিশ বার অথচ মুহাম্মদ ﷺ এর নাম এসেছে মাত্র পাঁচ বার। অতএব মুহাম্মদ ﷺ থেকে ঈসা (আ) শ্রেষ্ঠ। তাদের এ দাবী একেবারেই অযৌক্তিক। আমরা তখনই কারো নাম নেই যখন সে অনুপস্থিত থাকে। যখন ব্যক্তি উপস্থিত এবং তার সাথেই কথা বলা হয় তখন বার বার নাম না বলে তুমি, আপনি, বন্ধু বা অন্যান্য গুণাবলি বেশী উল্লেখ করে সম্বোধন করা হয়। কেননা যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তার নাম বার বার উচ্চারণের প্রয়োজন খুব একটা বেশী থাকে না। কোরআন যেহেতু মহানবী ﷺ এর উপরই নাজিল হয়েছে তাই যখন তার প্রসঙ্গ এসেছে তখন হে নবী, হে রাসূল, হে পথ প্রদর্শক ইত্যাদি বিশেষণে তাকে ডাকা হয়েছে। কেননা তিনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন বলে নাম উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় ও বেমানান।

কিন্তু কোরআনে যখন ঈসা (আ), মূসা (আ)-এর বিবরণ এসেছে তখন তারা উপস্থিত নয়, তাই তাদের নাম উল্লেখই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সর্বতভাবে যদি মুহাম্মদ ﷺ ও ঈসা (আ) এর উল্লেখ গুণে দেখা যায় তবে মুহাম্মদ ﷺ অবশ্যই অগ্রগণ্য। তবে আসল কথা হচ্ছে কার নাম কতবার আসলো সেটা সম্মান পরিমাপের মাপকাঠি নয়।

এখন দেখি তাদের পরবর্তী যুক্তি। অনেক মিশনারী বলে মুহাম্মদ ﷺ কি কোন মৃতকে জীবিত করেছেন? অথচ ঈসা মসীহ মৃতকে জীবিত করেছেন। অতএব যীশু বা ঈসাই শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, মহানবী ﷺ-এর অসংখ্য মুজিজা আছে তবে মৃতকে জীবিত করার কোন মুজিজা নাই। কিন্তু ঈসা (আ) যখন মৃতকে জীবিত করেছিলেন সেটা হয়েছিল بِاِذْنِ اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে। আসলে সকল মু'জিজা তা নবীই করুন না কেন সেটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই হয়ে থাকে তাই এখানে নবী বা রাসূলের শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় নাই। সকল মু'জিজাই আল্লাহ্‌র কুদরত। এনিয়ে মর্যাদার প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক। এখানে মহিমা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত। এটি কোরআন ও বাইবেল উভয় স্থানেই স্বীকৃত। গসপেল অব জোয়ান-এ বলা হয়েছে–

"ও গড, এর সবকিছুই তুমি করেছ, সব কুদরত তোমার।"

তাই মিরাকল বা মুজিযা যা ঘটে তার পূর্ণ মহিমা কুদরত ও শান আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত। যে ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর এ কুদরতি শক্তি জাহির করেন তার মধ্যে নয়। সে তো নিছক একটি মাধ্যম।

প্রশ্ন : ৩২০। খ্রিস্টান মিশনারীরা দরিদ্র লোকদের বিভিন্নভাবে ধোঁকার মাধ্যমে খ্রিস্টান করছে। মুসলিমগণও কি তাই করবে?

উত্তর : খ্রিস্টান মিশনারীগুলো গরীব মানুষকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। এটা অনৈতিক। আল্লাহ্ মুসলিমদেরকেও কালো-সোনা বা পেট্রো ডলার দিয়েছেন। আমরা কি সে অর্থ দাওয়াহ ইলাল্লাহের জন্য ব্যয় করছি? আমি বলছি না খ্রিস্টানদের মত ধোঁকাবাজী বা চালবাজী করার কথা কেননা ইসলাম সত্য। আমি বলছি দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এ অর্থ খরচের কথা।

খ্রিস্টান মিশনারীগুলো যদি মিথ্যাকে ছলাকলার আবরণে চালিয়ে অনেককে খ্রিস্টান করতে পারে আমরা কেন সত্যের দাওয়াত দিতে সময় ও অর্থ ব্যয় করছি না? দেখুন, এখন খ্রিস্টান মিশনারীগুলো শুধু দরিদ্রদের মাঝেই নয়, বিভিন্ন বেশে, ছদ্মাবরণে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করছে। তারা যদি উন্নত দেশের সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এসব অনুন্নত দেশে আসতে পারে, আমরা পারি না

কেন? মুসলমানদের মধ্যে কতজন দাওয়াত এর ফরজ কাজটি করার জন্য এভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে? দু'চারজন যে নাই তা নয়, তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমাদের অবশ্যই নৈতিকতার সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র নিমিত্ত অর্থ খরচ করতে হবে। আশা করি বিষয়টি এখন পরিষ্কার।

প্রশ্ন : ৩২১। আমি খলিলুর রহমান। আমি একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন করবো। বি, জে, পি দিনের পর দিন জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে আমরা এটি রুদ্ধ করতে পারি দয়া করে বলবেন কি?

উত্তর : আজকের আলোচ্য বিষয় "দাওয়াহ" আমি এ বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর দিতে আগ্রহী। তাছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছিও না। তবুও আপনার প্রশ্নের উত্তর দাওয়াহ্ এর দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন হাদীসের আলোকে দেয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমত দাওয়াহ পৌঁছাতে হবে সকলের কাছে তা সে বি, জে, পি হোক আর যেই হোক। মহানবী ﷺ কি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন নি যে কট্টর মুসলিম বিরোধী দু'জনের যেকোন একজনকে ইসলামে দাখিল করতে? সেই দোয়া কবুলের পর ইসলামের মহা শত্রু কি মহা বন্ধু হয়নি? তাহলে আমরা কেন ভাবতে পারি না যে, আজ যারা ইসলাম ও মুসলিমদের মহাশত্রু তারা সঠিকভাবে দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ বা দাওয়াহ ইলাল ইসলাম পেলে হয়তো বা একদিন আমাদের মহাবন্ধুও হতে পারে। অতএব দাওয়া-ই হল সর্বোত্তম উপায়।

দেখুন, আমরা মুসলিমরা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। আমরা কেউ বা হানাফী, কেউবা শাফেয়ী, কেউবা শিয়া, কেউবা সুন্নী ইত্যাদি বহু দল-উপদলে বিভক্ত। কিন্তু যখনই কোন সাম্প্রদায়িক হামলা হয় তখনই আমরা সকল মুসলমান এক হওয়ার সুযোগ পাই যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদেশ–"তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধর, কখনও বিচ্ছিন্ন হইও না" এটি পালন করতে পারি। তাই কোন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় হওয়া দেখে মুসলিমদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং আমরা যদি তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাই তবে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমাদের বন্ধুও হতে পারে। বাকী যারা থাকবে হয়তো তারা অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে পারে তবে তাতে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য আসবে যা তাদের ইসতিকামাহ (ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা) এ সাহায্য করবে। আর যদি দাওয়াহ ও ইসতিকামাহ একসাথে হয়ে যায় তবে আর ভয় কিসের? আল্লাহ্ চাহেতো এ দু'টি ধাপ পার হওয়ার পর তৃতীয় ধাপ তথা ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা হতে পারে। অতএব ভীত না হয়ে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করাটাই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

তাছাড়া আপনি কিভাবেই বা থামাতে পারবেন তাদের? যদি আপনি বলেন– 'এই বি, জে, পি থাম' তবে কি তারা থামবে? কখনও থাকবে না। আর আপনি প্রতি আঘাত করতে যান তবে নিশ্চিত শক্তিতে পারবেন না। অতএব হিকমাহ বা কৌশলই আসল পন্থা। তাদের গ্রন্থ সমূহ যেমন গীতা, রামায়ন, পুরান ইত্যাদি পড়ুন। অসামঞ্জস্যগুলো তাদের কাছে তুলে ধরুন তবে অবশ্যই যারা বুদ্ধিমান তারা ইসলামের ছায়াতলে আসবে। আবার সবাই যে আসবে এমনটাও নয়। আপনার দায়িত্বও নয় সবাইকে ইসলামের পতাকাতলে দাখিল করানো। আল্লাহ্ বরং নির্দেশ দিয়েছেন–

فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ـ

"তুমি তাদের সতর্ক কর। তুমি শুধু সতর্ককারীই।"

অতএব সতর্ক করা পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে ইক্বামাতে দ্বীন অবশ্যই সম্ভব। তবে এর আগে দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমত নিজেদের জীবনে ইসলামের পূর্ণ আমল আনতে হবে। দ্বিতীয়ত দাওয়াতের আঞ্জাম করতে হবে। তাহলে তৃতীয় বা চুড়ান্ত পর্যায় "ইক্বামাতে দ্বীন"অনেক সহজ হয়ে যাবে। তা না করে যতই রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে চান শক্তিতে পেরে উঠা যাবে না। তখন কুটচালের ভাষায় বলতে হবে– 'রাম মানে ইসলাম' এটা অনেক মুসলমান রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বলে, কিন্তু 'এটা সিরাতাল মুস্তাকিম' বা সহজ সরল পথ নয়। বরং তা থেকে অনেক দূরে। তাই দাওয়াহকে প্রাধান্য দেয়াই আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : ৩২২। আমি গত সাবান মাসে শুনেছিলাম অমুসলিমরা যেসব বিষয় নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার জবাবে বই লিখবেন। বইটি কি বের হয়েছে?

উত্তর : দেখুন, অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করে থাকে তার সংখ্যা পনের থেকে বিশের অধিক হবে না। তাদের সামনে যদি এই অভিযোগগুলো যেমন একাধিক বিবাহ, নারীর অধিকার ইত্যাদির জবাব দেয়া যায়, তবে ৯০% অমুসলিমের ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আর কোন সুযোগ বা বাহানা থাকবে না। এ উদ্দেশ্যে আমি বই লেখা শুরু করেছিলাম। তবে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে হয়ে ওঠেনি। প্রেস এর ঝামেলাও কম নয়। তবে যত ব্যস্ততা বা

সমস্যাই থাকুক না কেন আগামী দু' এক মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ বইটি প্রকাশ করা হবে। আসলে এটি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রথম কাজ হবে অভিযোগগুলো খণ্ডন করা। তা না করে ইসলামের যত গুণাবলীই তাদের সামনে তুলে ধরুন না কেন তা তাদের মনপুত হবে না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের ভাল গুণগুলো তার সামনে স্পষ্ট হবে না। ফলে ইসলামের বিরোধিতাও বন্ধ করা যাবে না আর বলবে মুসলমানেরা অনেক বিবাহকারী ও নারী অধিকার হস্তক্ষেপকারী ইত্যাদি।

অতএব ইসলাম সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ আছে সেগুলো খণ্ডন করে যদি আমরা নিজেদেরকে ইসলামী আমালের মাধ্যমে ইসলাহ আনতে পারি এবং সঠিকভাবে দাওয়াত আঞ্জাম দিতে পারি তবে অবশ্যই আমরা সফল হব। দেখুন দাওয়াহ এবং ইসলাহ বা পরিশুদ্ধ হওয়া পারস্পরিক জড়িত বিষয়। যখন আপনি দাওয়াহ শুরু করবেন ইসলাহ আপনা আপনি এসে যাবে। আপনি কাউকে যখন সালাতের দিকে আহবান করবেন তখন আপনি নিজে সালাত নিয়ে কখনই গাফিলতি করতে পারবেন না। আপনার মন আপনাকে বলবে আমি নিজেই মানুষকে সালাতে আহবান করি তবে আমি কিভাবে সালাতের ব্যাপারে শিথিলতা দেখাব? আমি গাফিলতি করলে ওরা কি বলবে?

এই ধরনের আত্মবিশ্লেষণ আপনাকে সালাতের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হতে সাহায্য করবে। একইভাবে শুধু আমল নয় 'ইলম'বা ইসলামী জ্ঞান অর্জনেও আপনাকে উৎসাহিত করবে দাওয়াহ এর কাজ। যখন আপনি কোন অমুসলিমকে দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম পৌছে দিতে যাবেন তখন সে ইসলামী সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরবে। এ পর্যায়ে আপনি এ বিষয়গুলোর জবাব খুঁজতে নিজে থেকেই প্রবৃত্ত হবেন। তখন আপনি ভাববেন কিভাবে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। নিজে না পারলে অন্যের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন এবং পথ পেয়ে যাবেন।

এ জন্য ইসলাহ বা সংশোধন এবং ইলম বা জ্ঞান অর্জন এ দুটোর জন্য বসে না থেকে আজ থেকেই দাওয়াহ এর কাজ শুরু করুন। দেখবেন ইসলাম ও ইলমের মানজিলে মাকসুদে আপনি কত দ্রুত, কত সহজে পৌছে গেছেন। আমার এ সম্পর্কিত লেখা বইগুলো এখনও প্রিন্টিং এর শেষ পর্যায়ে আসেনি। এর মধ্যে জেদ্দা মুম্বাই বার বার দৌড়ানোর কারণেও দেরী হয়েছে। ইনশাল্লাহ অতি সত্তর এসে যাবে। আপনারা দোয়া করুন।

প্রশ্ন : ৩২৪। তাহলে আপনি বলতে চান মুসলমানরা কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর মুখস্ত করবে আর সবাইকে এটি বুঝাবে তাদের ইবাদতের আর কোন প্রয়োজন নাই? আল্লাহ্ কি আমলের কথা বলেননি?

উত্তর : আমলকে বাদ দেয়ার তো কোন সুযোগই নাই। আগেই সূরা আসর থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যার মধ্যে চারটি শ্রেণীর লোক বাদে অন্য সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও 'সৎ আমালের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি যা বলছি তা হলোএই চারটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সৎ আমল নিজে করলাম আর দাওয়াহ এর কাজ থেকে বিরত থাকলাম তাহলে হবে না। অথবা আমি সৎ আমল করি না তাই কিভাবে দাওয়াহ এর কাজ করবো এমন অজুহাতও গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা আগে নিজে সৎ আমল করে অভ্যস্ত হই তারপর দাওয়াতী কাজ করবো এমনটাও বলা যাবে না। বরং আপনাকে দুটো কাজই এক সাথে করতে হবে। আর যখন আপনি দাওয়াতের কাজের আঞ্জাম দেবেন তখন সৎকর্ম করা দু'ভাবে সহজ হবে। প্রথমত নিজে যখন মানুষকে দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ করবেন তখন সৎকর্ম না করাটা আপনার মন সায় দেবে না। দ্বিতীয়ত দাওয়াহ এর কাজ করলে ইসলাম, ঈমান, কোরআন, হাদিস ইত্যাদির উপর বিশ্বাস এতই গভীর ও স্থির হবে যে নেক আমল বা সৎ কর্ম আপনি ছাড়তেই পারবেন না।

আপনি যখন কাউকে প্রমাণ করে দেবেন কোরআন সত্য তখন কিভাবে কোরআনের সেই আদেশ অবহেলা করতে পারবেন যেখানে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে? তাই পূর্বে যদিও আপনার মধ্যে এ্যালকোহলের অভ্যাস থেকে থাকে যে মুহূর্তে আপনি কোরআনের সত্যাসত্য হাতে কলমে প্রমাণিত করবেন তখন আর এ্যালকোহল গ্রহণ আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমাদের দাওয়াত সেন্টারের অনেক সদস্য যারা জীবনে সালাত আদায় করেন নি এখন দাওয়াত ইলাল্লাহ্ শুরু করায় পাক্কা মুসলিম হয়ে গেছে। এভাবে একটি অন্যটিকে সহজ করে দেয়। একটির অপেক্ষায় অন্যটি ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নাই আমি তাই বলছি। আমি বলছি না সৎ কর্মের প্রয়োজন নাই। বরং উভয়টিই ফরজ এবং সমান গুরুত্বের দাবীদার। আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার।

প্রশ্ন : ৩২৫। আপনি বলছেন দাওয়াহ আর ইসলাহ্ বা সংস্কার এক সাথে চালাতে। অনেক খ্রিস্টান বলে– আমরা ইসলামকে ঘৃণা করি না মুসলিমকে ঘৃণা করি। এতে কি প্রমাণিত হয় না ইসলাহ্ আগে প্রয়োজন?

উত্তর : ইসলাহ্ অবশ্যই প্রয়োজন। আমি সৎকর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না। আমি যা বলছি তা হলো ইসলাহের অজুহাতে দাওয়াহ এর কার্যক্রম বন্ধ

থাকতে পারে না। আর যারা বলে যে তারা ইসলামকে ঘৃণা করে না মুসলিমকে ঘৃণা করে তাদের বলুন যে আমরা তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকছি মুসলিমের পথে নয়, আমরা বলছি ইসলাম গ্রহণ করুন ও ইসলামের বিধান অনুসরণ করুন। আমরা কি বলছি মুসলমানকে অনুসরণ করুন? আপনি যখন তুলনা করবেন তখন ইসলামের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের, ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মের। মুসলিমের সাথে খ্রিস্টানের নয় বা মুসলিমের সাথে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর নয়। মনে করা যাক, আপনি একটি নতুন মার্সিটিজ গাড়ি কিনলেন ও ড্রাইভার নিয়োগ দিলেন। এখন ড্রাইভারের অজ্ঞতায় বা অপরিপক্কতায় গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হল। এখন কি আপনি মার্সিটিজ কোম্পানির দোষ খুঁজবেন না কি ড্রাইভার বা চালক বদল করবেন? অবশ্যই চালক বদল করবেন। অতএব কোন মুসলিমের অবস্থা দেখে আপনি ইসলামকে দোষারোপ করতে পারেন না।

পৃথিবীতে ধর্ষণের ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটে কোথায়? পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে অর্থাৎ খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলোতে। তাই বলে কি আপনি বলবেন খ্রিস্ট ধর্ম ধর্ষণের জন্য দায়ী? খ্রিস্ট ধর্মতো ধর্ষণকে নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণে কোন ধর্মের মানুষ দেখে ঐ ধর্মকে জানা বা বুঝা যায় না। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মত, তারা যখন মুসলমানদের দোষ ধরে ইসলামকে দোষারোপ করে এবং এক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে যে অংশটি খুবই দুর্বল তাদের উদাহরণ দেয়। কিন্তু নিয়ম তো এটি নয়। আপনি উৎকৃষ্ট হিন্দুর সাথে উৎকৃষ্ট মুসলিমের তুলনা করে দেখুন কারা উত্তম। খ্রিস্টানদের উৎকৃষ্ট অংশের সাথে মুসলমানদের উৎকৃষ্ট অংশের তুলনা করে দেখুন কারা শ্রেষ্ঠ। এটি না করে মুসলিমগণের নিকৃষ্ট অংশকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে ইসলামের বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? যদি নৈতিকতার বিচারে সামগ্রিকভাবে দেখেন তবে দেখবেন সমষ্টিগতভাবেও মুসলিমগণ এগিয়ে, মদ, ধর্ষণ, বেহায়াপনা ইত্যাদিতে সামগ্রিকভাবে মুসলিমগণ অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী থেকে অনেক ভাল অবস্থানে আছে। তাই তারা ইসলাম নিয়ে যে সব অভিযোগ করে থাকে যেমন বহু বিবাহ, নারী অধিকার ইত্যাদি নিয়ে যদি আমরা যৌক্তিকভাবে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরতে পারি তবে অবশ্যই তারা হয় নিশ্চুপ থাকবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন : ৩২৬। অনেক মুফতি বলে থাকেন 'দাওয়াহ' ফরজে কিফায়া। জানাযাহ এর সালাত যেমন কয়েকজন পড়লেই পুরো সম্প্রদায় থেকে করা হয়েছে এমন বুঝায় তেমনি কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি যদি দাওয়াত এর কাজ করে থাকে তবে সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে। এর পক্ষে

তারা সেই আয়াতটি উল্লেখ করে যা আপনিও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে একদল লোক থাকবে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকবে। এখানে 'একদল' মুসলিমের কথা বলা হয়েছে সবার কথা নয়। দাওয়াহ যে সকলের উপর ফরজ নয় এর পক্ষে ঐ মুফতিগণ আরও যুক্তি দেন যে হাদিসে আসছে ইসলামে ফরজ পাঁচটি যথা ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত। তারা আরও যুক্তি দেন ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম তাই সবাই দাওয়াতের কাজ করবে এটা স্বভাব বিরুদ্ধ। এভাবে তারা নানা যুক্তি দেয়। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

উত্তর : প্রথম কথা হচ্ছে মুফতি কোন দলীল নয় বরং দলীল কুরআন ও হাদীস। আপনি বলছেন কিছু মুফতি বলেন এটা এমন ইত্যাদি। আমি যদি বলি অনেক মুফতি বলেন দাওয়াহ ফরজ তখন আপনি কি করবেন? এজন্য বলছি মুফতি নয় বরং কোরআন ও হাদীস আমাদের প্রথম স্থান যেখান থেকে সমাধান পাব। আপনার মুফতিগণ বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেছেন। এবার আসা যাক যুক্তিগুলোর ব্যাপারে।

প্রথমেই বলেছেন এটি ফরযে কেফায়া অর্থাৎ কয়েকজন করলে সবার পক্ষ থেকে হয়ে যাবে। জানাযাহ এর সালাত যেভাবে হয়ে যায়। দেখুন, জানাযাহ এর সালাত পড়তে হয় কেউ মারা গেলে। এটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে কেউ মারা যায় বলে কারা জানাযার সালাতে অংশ নিলএবং কারা অংশ নিল না তা সহজেই পার্থক্য করা যায় এবং সকলের পক্ষ থেকে আদায় হল কিনা তা বোঝা যায়। কিন্তু দাওয়াতের কাজ সব সময়ের জন্য সব মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। এটি নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এখন আপনিই বলুন কে কোথায় দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে তার উপর আপনি ভরসা করবেন? পৃথিবীর কোথায় কোন মুসলিম দাওয়াতের দায়িত্ব করছে সেই খোঁজ করবেন না কি নিজেই পালন করা শ্রেয় মনে করবেন? আপনি বলতে পারেন আমার এলাকায় কেউ করলেই আমারও হবে। এতবড় মুম্বাই শহরে কেউ দাওয়াতের কাজ করছে কিনা অথবা অন্য সব মুসলিম দাওয়াতের কাজ করছে এই আশায় বসে আছে তা জানবেন কিভাবে? আবার 'একটি দল' বলে যে আয়াতটি আছে সেখানে 'ফুলটাইম' দাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য স্থানে আল্লাহ্ বলেন–

"তোমরা উত্তম জাতি, তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ দাও, অসৎ কাজে বাধা দাও।"

এখানে "তোমরা" বা 'কুনতুম' দিয়ে সকলকে বোঝানো হয়েছে। কোন একটি দল নয় বরং পুরো মুসলিম জাতি। তাদের এই উত্তম হওয়ার শর্তই হচ্ছে দাওয়াহ তথা সৎপথে আদেশ ও অসৎ পথে বাধা। এ আয়াতের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? আবার সূরা আসরে আল্লাহ্ বলছেন "সকল মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন।" শুধুমাত্র চারটি দাবী পূরণকারী শ্রেণী ছাড়া।" এ সূরার কি ব্যাখ্যা করবেন।

এরপর আসা যাক হাদীসটির বিষয়ে। হাদীসটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন হাদীসটি দ্বারা পাঁচটি ফরজের কথা বলা হয়েছে। আসলে তা নয়। এখানে বলা হয়নি ইসলামের পাঁচটি ফরজ বরং বলা হয়েছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা খুঁটি বা পিলার। হ্যাঁ, এগুলো ফরজ অবশ্যই তবে শুধু পিলারকে আপনি পুরো বিল্ডিং বলতে পারেন না। বিল্ডিং এর জন্য আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। একথা ঠিক পিলার যত মজবুত হবে বিল্ডিং তত মজবুত হবে এবং পিলার শক্তিশালী না হলে বিল্ডিং কোনভাবেই মজবুত করা যাবে না তেমনি একথাও ঠিক শুধু পিলার তৈরী করলেই বিল্ডিং হবে না এবং বসবাস করা যাবে না। অতএব ইসলাম বলতে শুধু ঐ পাঁচটি কাজই নয় আরও অনেক কিছুই করার আছে। আমরা এজন্যই বলেছি দাওয়াহকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। অনেকের যুক্তি দেখানোর নামে অযৌক্তিক অজুহাত দেখানোর এই মানসিকতা ও প্রবৃত্তি থেকে বের হতে পারলেই কেবল আমরা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবো এবং ইহ ও পারলৌকিক জীবনে আমরা সফল হব। আশা করি আর কোন সংশয় আর নেই এ বিষয়ে।

প্রশ্ন : ৩২৭। কোন অমুসলিম মুসলিম হলে তার নাম পরিবর্তন কি অত্যাবশ্যক?

উত্তর : নাম সেটা কেউ মুসলিম আগে থেকেই থাকুন আর নতুন হোন না কেন যদি শিরকের অন্তর্গত হয় তবে জানামাত্র পরিবর্তন করতে হবে। নামের ব্যাপারে এটাই প্রথম কথা। সাধারণত মুসলিমের নাম শিরক থেকে পবিত্র থাকে। কিন্তু অনেক অমুসলিম থাকে যাদের নাম অর্থের দিক বিবেচনায় শিরক এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ অবস্থায় মুসলিম হওয়ার সময় তার নাম পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। মুসলমানদের নামের নিজস্ব একটি স্টাইল বা সংস্কৃতি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নাম দেখেই চেনা যায়। তাই অমুসলিম অবস্থায় যে নাম ছিল তা যদি শিরক দোষে দুষ্ট নাও হয় কিন্তু পূর্বের ধর্ম পরিচয় নাম থেকেই বুঝা যায় তবে পরিবর্তন করাই শ্রেয়। অনেক আগে আমার কাছে এক নব মুসলিম নারী এসেছিল এক ব্যাপারে আপত্তি নিয়ে। সে অভিযোগ করলো তার নাম রীতা আর পঁচিশ বছর ধরে এ নামে সে অভ্যস্ত। এখন তার এ নামটি ত্যাগ না করলেই কি নয়? আমি

বললাম রীতা নাম পরিবর্তন করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। আবার পঁচিশ বছর ধরে অভ্যস্ত তাই এটা পরিবর্তন করা যাবে না এটাও কোন কথা নয়। অনেক মেয়ের নামই বিয়ের পূর্বে থাকে তাহমিনা হোসাইন বা খানম কিন্তু বিয়ের পর হয়ে যায় তাহমিনা হক বা খন্দকার এমন অন্য কিছু। তাই বলে কি তারা অসন্তুষ্ট? তাই বলা যায় শিরক দোষে দুষ্ট নাম না হলে তা পরিবর্তন না করলেও চলবে। মহানবী ﷺ এর সময় অনেক সাহাবী (রা)ই তাদের পূর্বনাম ঠিক রেখেছিলেন।

শুধুমাত্র পৌত্তলিকতা বা শিরক দোষে দুষ্ট নামগুলোই পরিবর্তন করতে হবে। এমন অনেক আরব অমুসলিম আছে যাদের আরবী নামের কারণে মনে হয় যে সে বুঝি মুসলিম। অথচ সে অমুসলিম। এ কারণে নামের অর্থটাই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিৎ। তবে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে নাম পরিবর্তন যদি জীবনের জন্য হুমকি বিবেচিত হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে সেটা না করাই শ্রেয় যদিও নামটি পৌত্তলিকতা বা শিরক মিশ্রিত হয়। দেখুন নাম পরিবর্তন না করলে হবে বলবে না এমন কথা আমরা বলতে পারি না। আল্লাহ্ বলেছেন– "আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম কর না।" এতে বোঝা যায়, অনেকেই অনেক বৈধ বিষয় কঠিন করে ফেলে অবৈধ ভাবতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ এটি নিষেধ করেছেন এমতাবস্থায় পূর্বের নাম রাখা ঠিকই হবে না এটা বলা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন নাম রাখলে ক্ষতি নেই বরং তা আনন্দের। আল্লাহ্ এ জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৩২৮। আমরা সময়ের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। সম্ভবতএটিই শেষ প্রশ্ন যদি নতুন আর কোন প্রশ্ন না করা হয়। শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে কিভাবে আমরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?

উত্তর : এখন যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তার উত্তর আরেকটি লেকচার দাবী করে। এ বিষয়ে "কোরআন কি আল্লাহ্র বাণী" এই লেকচারে বিস্তারিত বলা হয়েছে? এখান থেকে বিস্তারিত উত্তর পাওয়া যেতে পারে। তবে এখন আমরা সংক্ষেপে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেব। প্রথমত আমরা নাস্তিককে ধন্যবাদ জানাতে পারি। অনেকেই এটা শুনে আশ্চর্য হতে পারেন যে নাস্তিককে আবার কিভাবে ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে? দেখুন, যে শিরক করে তার নিকট এক আল্লাহ্র বাণী পৌছাতে হলে প্রথমে অন্যান্য বিধাতার অসারতা প্রমাণ করতে হয় এরপর আল্লাহ্র একত্ববাদের ধারণা তাকে বিশ্বাস করতে হয়। এখানে কাজ দুটো অন্যান্য কল্পিত বিধাতার অসারতা প্রমাণ করা এবং এরপর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যে নাস্তিক সেতো "কালেমাহ" এর প্রথম অংশ لَا إِلٰهَ বা

"কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই" এটুকু মেনে নিয়েছে। এখন বাকীটুকু إِلَّا اللّٰهُ। বা "আল্লাহ্ ছাড়া" এটুকু বিশ্বাস করাতে হবে। অর্থাৎ কালেমা'র প্রথম অংশ বিশ্বাস করে এখন দ্বিতীয়াংশ বিশ্বাস করানোই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ঠিক আছে নাস্তিককে প্রশ্ন করুন কোন দ্রব্য এখনও বাজারে আসেনি বা নতুন আজকেই আসলো। এ দ্রব্য বা পন্য সম্পর্কে কে বেশী জানবে? অবশ্যই দ্রব্য বা পণ্যটি নির্মাতা বা উৎপাদনকারী। এরপর আস্তে আস্তে সরবরাহকারী, মেরামতকারী এবং আরও পরে ব্যবহারকারী এটা সম্পর্কে জানবে। কিন্তু নির্মাতা বা উৎপাদক বা উদ্ভাবক যত বেশী জানেন অন্য কেউ ততটা বেশী জানেন না। হ্যাঁ আপনি নাস্তিকের নিকট প্রশ্ন করে এ উত্তর তার নিকট থেকেই জানবেন।

এবার আপনি সামনে অগ্রসর হোন। তাকে আবার প্রশ্ন করুন এবং বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? তিনি হয়তো বলবেন "বিগব্যাং থিওরির কথা। বিগব্যাং থিওরির বর্ণনা অনুযায়ী মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের মধ্যে বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে এ পৃথিবীর সৃষ্টি। আপনি এবার তাকে বলুন এ মহা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মানুষ কবে জানতে পারে? এইতো বলতে গেলে গতকালই। ১৯৭৩ সালের দিকে এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করা হয়। অথচ এ ধরনের মহা বিস্ফোরণের কথা পবিত্র কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে চোখ বুলান। সেখানে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেন–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ -

অর্থ: যারা অবিশ্বাসী তারা কি দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উভয়ে একাকার ছিল, তারপর আমরা তাদের দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম, আর পানি থেকে আমরা সৃষ্টি করলাম প্রাণবন্ত সবকিছু? তারা কি বিশ্বাস করবে না?

বিজ্ঞান যা গতকাল আবিস্কার করেছে কোরআন তা চৌদ্দশত বছর আগে প্রমাণ করেছে। বাতলে দিয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য। আসলে এটা কি কোন মানুষের লেখা হতে পারে? অবশ্যই না, পৃথিবীর রাতদিনের বাড়া কমার রহস্য বা জমিনের স্ফীত হওয়ার রহস্য এটি মানুষ জানতে পেরেছে সর্বোচ্চ দু'শত বছর পুর্ব থেকে অথচ আল কোরআন ১৪০০ বছর আগেই তা বর্ণনা করেছে। আল-কোরআনের সূরা লুকমান ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা দেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

অর্থ: "তুমি কি দেখ না যে তিনি রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। আর চাঁদ ও সূর্যকে যিনি করেছেন অনুগত। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিচরণ করে।"

তাহলে চন্দ্র ও সূর্যের গতিপথ ও গতিপথ যে নির্দিষ্ট তা আল্লাহ্ কোরআনে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন। আর আমরা এই সেদিন এটা প্রমাণিত হয়েছে বলে জেনেছি। সূরা জুমার ০৫ নং আয়াতে বর্ণনা করেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ -

অর্থ: "তিনি রাতকে দিনের উপর ছাউনি বানান আর দিনকে ছাউনি বানান রাতের উপর। চাঁদ ও সুরুজ কার বশীভূত? প্রত্যেকেই তাদের গতিপথে ধাবিত হচ্ছে।"

তাহলে চন্দ্র ও সূর্যের গতিপথ যে নির্ধারিত যা আমরা এই সেদিন বিজ্ঞানের মাধ্যমে জেনেছি অথচ পবিত্র কোরআন দেড় হাজার বছর আগেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়া সূরা নাজিয়া এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণনা করেন–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا -

অর্থ: "তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন।"

পৃথিবী এই যে সৃষ্টি রহস্য তা আমরা এখনও অনুসন্ধানে ব্যস্ত। অথচ তা হলো সূর্যের আলো চাঁদের উপর প্রতিফলিত হয় মাত্র। এ ব্যাপারটি কোরআনের বর্ণনায় এসেছে– সূরা ফুরক্বান এর ৬১ নং আয়াতে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ: "মহান আল্লাহ্ মহাকাশে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি। আর তাতে বানিয়েছেন এক প্রদীপ ও এক চন্দ্র। আর চন্দ্রতো দীপ্তিদায়ক।"

দেখুন, আল্লাহ্ চাঁদের ব্যাপারে বলেছেন এটি "মুনির" অর্থাৎ অন্যের আলোকে আলোকিত। এই যে প্রতিফলিত আলোর কথা বলা হয়েছে এটি দেড় হাজার বছর আগে কে কল্পনা করেছে? তাহলে কোরআন অবশ্যই মানব রচিত নয়। আসুন আরও এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা জেনে নিই যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে অথচ মানুষ প্রমাণিত করেছে সেদিন।

চন্দ্র-সূর্যের এই যে কোটেশন বা ঘূর্ণন পথ তা আমরা ২ শত বছর আগে জেনেছি অথচ পবিত্র কোরআনে সূরা আম্বিয়া ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা পরিস্কার ভাষায় বিধৃত করেছেন। তিনি বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ: "আর তিনিই সেই জন যিনি রাত ও দিনকে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। সব ক'টি কক্ষপথে ভেসে চলে"।

এভাবে কক্ষপথে ভেসে চলার বিষয়টি কোরআনের পূর্বে কে বলতে পেরেছে?

একই সূরায় ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ـ

অর্থ: "আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি"

পৃথিবীকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড় পর্বতের এ ভূমিকার কথা, প্রয়োজনীয়তার কথা কোরআনের পূর্বে আর কার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে?

সূরা ইয়াছিনের ৩৮-৪০ নং আয়াতে ও আল্লাহ্ চন্দ্র সূর্যের গতিপথ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এত বিষদভাবে এই বিজ্ঞানসিদ্ধ বার্তাগুলো আর কে কোরআনের পূর্বে বলেছে?

সমাপ্ত